জীবন মানেই দৌড়

তানিয়া কামরুন নাহার

সকালে ঘুম থেকে উঠেই দ্রুত তৈরি হয়ে দৌড় দিতে হয় অফিসের উদ্দেশ্যে। রওনা দিতে ৫ মিনিট এদিক ওদিক হলেই ট্রাফিক জ্যামের চক্করে পড়ে গিয়ে আছে লেট খাবার ভয়। সুতরাং, দাও দৌড়। অফিসে এসেও কাজের চাপ। শুরু হয় কাজ নিয়ে দৌড়াদৌড়ি। অফিস শেষে আবার বাসার উদ্দেশ্যে দৌড়। এর মধ্যে পরিবারের সবার জন্য রান্না করা, ঘরের সকল কাজ গুছিয়ে করা, সন্তানদের দেখভাল করা তো আছেই। গৃহিণী বা কর্মজীবী যেই হোন, নগরের প্রায় প্রত্যেক নারীর প্রতিদিন এভাবেই সীমিত সময় আর একগাদা কাজের মধ্যে সমন্বয় করার এক দৌড়ের মধ্যে দিয়ে কাটে। শুধু কি শহরের নারীর বেলায়ই এরকমটি ঘটে? গ্রাম বাংলার খুব সাধারণ আটপৌরে নারীদেরও ঘরে, উঠোনে, ফসলের মাঠে বিভিন্ন কাজে দৌড়ের মধ্যেই থাকতে হয়। জীবনের এই ম্যারাথন দৌড়ের রেসে দৌড়ুতে দৌড়ুতে কখনো তাঁরা হাঁপিয়ে ওঠেন, ক্লান্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তা খুব অল্প সময়ের জন্য। তারপর আবার পুরো উদ্যমে শুরু করেন দৌড়। কারণ এখনো অনেকটা পথ পাড়ি দেওয়া বাকি। আর এই পুরো পথ একাই পাড়ি দেবার শক্তি, সাহস ও সামর্থ্য রাখেন এই প্রাণময়ী নারীরা। আর সেই নারীদের জন্যই গত ১২ আগস্ট ২০১৬ তারিখে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, এভারেস্ট একাডেমি ও বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের আয়োজনে প্রায় ৩০০ নারীর অংশগ্রহণে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প্রথমবারের মতো 'ঢাকা ওমেনস ম্যারাথন ২০১৬'। তবে ঢাকার নারীদের ম্যারাথন দৌড়ের কথা বলার আগে ম্যারাথন দৌড়ের ইতিহাস নিয়ে কিছু বলার লোভ সামলাতে পারছি না।

লৌকিক এক উপাখ্যান থেকে জানা যায় যে, খ্রিষ্টপূর্ব ৪৯০ সালে ম্যারাথনের ময়দানে পারস্যবাসীদের সাথে গ্রিকরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সে যুদ্ধে পারস্যবাসীদের পরাজিত করে গ্রিকরা। গ্রিকদের যুদ্ধজয়ের খবরটি এথেন্সবাসীদের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দেওয়া হয় ফেইডিপ্পিডেস নামের এক সৈন্যকে। ফেইডিপ্পিডেস যুদ্ধের ময়দান থেকে এথেন্স পর্যন্ত দীর্ঘ পথ কোথাও না থেমে এক দৌড়ে পাড়ি দেন। এথেন্সবাসীদের কাছে পৌঁছে তিনি চিৎকার করে শুধু 'নিকোমেন', অর্থাৎ 'আমরা জয়ী হয়েছি' এই কথাটুকুই উচ্চারণ করতে পারেন। ক্লান্ত ফেইডিপ্পিডেস এরপর মাটিতে পড়ে যান এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ম্যারাথন থেকে এথেন্স পর্যন্ত ফেইডিপ্পিডেসের এই দীর্ঘ দৌড়ের সম্মানে উনিশ শতকের শেষদিক থেকে আধুনিক অলিম্পিক ক্রীড়াতে 'ম্যারাথন দৌড়' ইভেন্টটি রাখা হয়।

শুরুর দিকে ম্যারাথন দৌড়ের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো দূরত্ব নির্ধারিত ছিল না। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুরুর দিকের আসরে নির্দিষ্ট দূরত্ব নির্ধারণ করা না হলেও আনুমানিক ৪০ কিমি বা ২৫ মাইল রাখা হয়। ম্যারাথন দৌড়ের আদর্শ মানদণ্ডের দূরত্ব মে ১৯২১ সালে ইন্টারন্যাশনাল অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশন বা আইএএএফ কর্তৃক নির্ধারিত হয়। এতে ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ বা ৪২.১৯৫ কিমিকে আদর্শ মানদণ্ড ধরা হয়।

অলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড়ের ইভেন্টটিতে শুরুর দিকে নারীদের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না। স্টেমেথিস রাভিথি ম্যারাথনে নারীদের অংশগ্রহণ করার বিষয়টি সর্বপ্রথম প্রস্তাব করেন। এর এক মাস পর ম্যারাথন দৌড়ের ইভেন্টে মেলপোমেনে নামের একজন নারী পুরুষদের সাথেই দৌড়ে অংশ নিতে চান। অলিম্পিক কমিটি মেলপোমেনের এমন আবদার মেনে নেয় নি। এরপর মেলপোমেন সকল বাধা অগ্রাহ্য করে পুরুষদের সাথেই ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ছিলেন সকল পুরুষ অংশগ্রহণকারীর পেছনে। কিন্তু এর মধ্যে একজন পুরুষ অংশগ্রহণকারী ক্লান্ত হয়ে রেস থেকে বিদায় নিলে মেলপোমেন তাকে পেরিয়ে সামনে এগিয়ে যান। এই দৌড়ে প্রথম বিজয়ী নির্ধারিত হয়ে যাবারও দেড় ঘণ্টা পর মেলপোমেন নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছেন। পুরো খেলা ততক্ষণে শেষ হয়ে যায়। স্টেডিয়াম ছিল খালি। কোনো দর্শকই ছিল না সেসময়। তবু মেলপোমেন থামেন নি, দৌড় বন্ধ করেন নি। পুরো দৌড় সম্পন্ন করতে তিনি সাড়ে চার ঘণ্টা সময় নেন। এর পরের দিন গ্রিসের সংবাদপত্রগুলোতে মেলপোমেনের এই অপ্রতিরোধ্য, হার না মানা দৌড়ের কথা শিরোনাম হয়ে আসে। কিন্তু তখনো কেউ জানত না, নতুন শতাব্দীতে খুব শীঘ্রই নারীদের অংশগ্রহণে অলিম্পিকে অনুষ্ঠিত হবে ম্যারাথন দৌড়। ঘটনাটি ছিল ১৯৮৬ সালের।

১৯৭২ সালের প্রায় একই রকম আরেকটি ঘটনা থেকে জানা যায়, রবার্টা গিব নামের একজন নারী ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন এবং হঠাৎ ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে পুরুষদের সাথে ম্যারাথনে অংশ নেন। সে সময় নারীদের ম্যারাথনে অংশ নেবার কোনো নিয়ম ছিল না। গিব বলেন, 'কোনো নারীবাদী বক্তব্য দেবার জন্য আমি এখানে অংশ নিই নি। আমি শুধু দূরত্বের বিপক্ষে (পুরুষদের বিপক্ষে নয়) দৌড়েছি এবং নিজের ভেতরের শক্তিকে পরিমাপ করেছি।'

প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ম্যারাথন দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। আর পেশাদার খেলোয়াড়দের পাশাপাশি প্রচুর সৌখিন খেলোয়াড়ও এতে অংশ নিয়ে থাকেন। সাধারণত প্রচুর দর্শক সমাগমের সাথে মহাসড়কগুলোতেই এই দৌড় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ম্যারাথন দৌড় আর তার ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে গেলে আরেকটা আরব্য রজনী হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলার নারীদের ম্যারাথনের প্রসঙ্গেই আবার ফিরে আসি। ফেসবুকে যখন নারীদের জন্য ম্যারাথন দৌড়ের ইভেন্টের কথা জানতে পারলাম, দেরি না করে সাথে সাথে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে ফেললাম। নারীদের প্রথম ম্যারাথনে অংশ নিয়ে ইতিহাসের একটা অংশ হবার সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নই আমি। ১০ কিমি দৌড়াতে হবে ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিটের মধ্যে।

নির্ধারিত দিনে টিএসসিতে গিয়ে পরিচিত অনেকের সাথে দেখা হয়ে গেল। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পাহাড় কেওকারাডং অভিযানে আমার সঙ্গী নার্গিস ও জুবাইরার সাথে দেখা হলো। দেখা হলো, হলিক্রস কলেজে আমাদের ক্রীড়াশিক্ষক মিউরিয়েল মিসের সাথে। এ ছাড়াও ক্যাম্পাসের বন্ধু, এলাকাভিত্তিক মেয়েদের নেটওয়ার্ক শক্তির বন্ধু, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার বন্ধুদের সাথেও দেখা হয়ে গেল। খুব ভালো লাগছিল অনেকদিন পরে ওদের সাথে দেখা হবার কারণে। নতুন নতুন আরো কিছু বন্ধুও হলো। আর বন্ধু মানেই একগাদা ফটোসেশন। নানারকম দৌড়ের মজার মজার পোজ দিয়ে ছবি তুললাম আমরা।

আমাদের দেশে মেয়েদের খেলার সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। মেয়েরা একটু বড়ো হয়ে গেলেই তাদের বন্দি করে ফেলা হয়। ইভটিজিং-এর ভয়ে তারা অনেক সময় বাসার বারান্দাতেও যেতে পারে না। এ ছাড়াও, মেয়েদের খেলাধুলা করাকে রক্ষণশীল সমাজ খুব ভালো চোখে দেখে না। মেয়েরা খেলতে এলেও প্রথম বাধার শিকার হয় পোশাক বা জার্সি নিয়ে তীর্যক মন্তব্যে। অথচ শাড়ি, বোরকা ইত্যাদি খেলার জন্য উপযুক্ত নয়। ইত্যাদি নানাবিধ কারণে নারীরা খেলাধুলা ও শরীরচর্চা থেকে সবসময় পিছিয়ে থাকে। অথচ সুস্থ সুন্দর জীবনের জন্য নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সকলেরই খেলাধুলার প্রয়োজন রয়েছে। এরকম প্রেক্ষাপটে মূলত নারীদের খেলার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে, নারীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে, নারীর ক্ষমতায়নে, নারীর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে এবং জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে নারীদের জাগ্রত করতেই এই ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়।

দৌড় শুরু হবার আগে থেকেই অন্য খেলোয়াড়দের সাথে কথা হচ্ছিল। অনেকেই পেশাদার খেলোয়াড়, আবার অনেকে আমার মতো পুরোপুরি সৌখিন। গিয়ে দেখি ১২ বছরের ছোট্ট এক মেয়েও এসেছে দৌড়ে অংশ নিতে। কথা হলো ৬০ বছর বয়সী বাংলার এক অদম্য নারীর সাথে, ভাতিজিদের উৎসাহ দিতে তিনিও দৌড়ে অংশ নেবেন। আমার আবার শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে, একথা শুনে অন্য অংশগ্রহণকারীরাও উৎসাহ দিচ্ছিল। আমরা সবাই সেখানে সবাইকে উৎসাহ দিচ্ছিলাম। নিজেদের দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা আবার সেই সাথে নিজেদের সামর্থ্য সম্পর্কেও আমরা ওয়াকিবহাল ছিলাম। দৌড় শুরুর আগে চিন্তা হচ্ছিল, পারব তো মাত্র ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিটের মধ্যে ১০ কিমি দৌড় শেষ করতে? কিন্তু সেই চিন্তা পরক্ষণেই ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছিলাম। এখানে আমি তো প্রথম বা দ্বিতীয় হতে আসি নি। আমি এসেছি নিজের শক্তিকে যাচাই করতে। যত সময়ই লাগুক, পুরো ১০ কিমিই দৌড়াব। এটা নিছক একটা দৌড় নয়, এটা নিজেকে জানারও একটা প্রচেষ্টা।

নারীদের ১০ কিমি দৌড়ের পাশাপাশি আরেকটি মিনি ম্যারাথনও সেখানে অনুষ্ঠিত হয়। মা ও তার ৫ বছর বয়স পর্যন্ত সন্তানকে নিয়ে অনুষ্ঠিত সেই মিনি ম্যারাথনের নাম দেওয়া হয় 'মামাথন'। আর নারীদের জন্য ১০ কিমি দৌড়ের রুট ছিল টিএসসি-শাহবাগ মোড়-সায়েন্স ল্যাব-আজিমপুর মোড়-পলাশী মোড়-বুয়েট-ঢাকা মেডিক্যাল-জাতীয় শহীদ মিনার-দোয়েল চত্বর-শিক্ষা ভবন-কদম ফোয়ারা-মৎস্য ভবন-কাকরাইল মসজিদ-হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল-ইস্কাটন গার্ডেন রোড-কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ-রূপসী বাংলা-টিএসসি। এই রুটের মধ্যে একটি স্পট থেকে Dhaka Women's Marathon 2016 লেখা নির্ধারিত নীল রঙের রিস্ট ব্যান্ড সংগ্রহ করে হাতে পরতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ম্যারাথন দৌড়ের উদ্বোধন করেন। একটি ফাঁকা গুলির আওয়াজ

শুনে আমরা বিভিন্ন বয়সী নারীরা দৌড়ুতে শুরু করি। দৌড়ের প্রথমে সবাই দ্রুত দৌড়ালেও আস্তে আস্তে সবার গতি কমতে থাকে। কিন্তু কেউই হাল ছাড়ি না আমরা। যেভাবেই হোক পুরো ১০ কিমি যাবই যাব, আমরা নারীরাও পারি অনেক দূর যেতে। এই দৌড় আয়োজনে সহযোগিতার জন্য পথে পথে অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক, আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী ছিল, তারা বারবার থাম্পস আপ করে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছিল। একজন নারীও যেন ইভটিজিং-এর শিকার না হোন এজন্য সবাই ছিল সতর্ক। রাস্তার উৎসাহী পথচারী ও জ্যামে আটকে পড়া সাধারণ মানুষই ছিল আমাদের দর্শক। তারাও আমাদের ছবি তুলছিল, ভিডিও করছিল, উৎসাহ দিচ্ছিল, নানারকম মন্তব্য করছিল। অনেকেই বিরক্ত হচ্ছিল রাস্তা আটকে এভাবে ম্যারাথন দৌড় দেবার জন্য। আসলে ম্যারাথন দৌড় সারা পৃথিবীতে এভাবেই মহাসড়কে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের এখানে যেহেতু সব ধরনের সুযোগসুবিধা অপ্রতুল এবং ঢাকায় যেহেতু সড়কগুলো অনেক জ্যামপ্রবণ, কাজেই গণমাধ্যমগুলোতে এই ম্যারাথনের খবরটি আগে থেকে জানিয়ে রাখা উচিত ছিল। এতে মানুষ ভিন্নপথ ব্যবহার করে চলাচল করতে পারত।

১০ কিমির এই ম্যারাথন মাত্র ৪৮ মিনিট ২২ সেকেন্ডে সম্পন্ন করে প্রথম স্থান অধিকার করেন সেনাবাহিনীর খেলোয়াড় সুমি আক্তার। দৌড় সম্পন্ন করতে আমার সময় লেগেছিল ১ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট। শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকায় অবিরাম দৌড়াতে পারি নি, কিন্তু তাই বলে থামিও নি। কচ্ছপের মতো ধীরে ধীরে শুধু সামনে এগিয়ে গিয়েছি। শাহবাগ মোড়ে এসে যখন পৌঁছাই, ততক্ষণে দৌড়ের গতি অনেক কমে গেছে। স্বেচ্ছাসেবকেরা বারবার তাড়া দিয়ে বলছিল, আপনি আরো দ্রুত দৌড় দিন, আর মাত্র তিন মিনিট আছে। তিন মিনিটের ভিতরে টিএসসি পৌঁছাতে হবে। আর আমি ভাবছিলাম জীবনানন্দ দাশের কথা,

> আমি অতো তাড়াতাড়ি কোথাও যেতে চাই না;
> আমার জীবন যা চায় সেখানে হেঁটে হেঁটে পৌঁছুবার সময় আছে,
> পৌঁছে অনেকক্ষণ বসে অপেক্ষা করবার অবসর আছে।
> জীবনের বিবিধ অত্যাশ্চর্য সফলতার উত্তেজনা
> অন্য সবাই বহন করে করুক; আমি প্রয়োজন বোধ করি না

আমি আমার মতো ধীরে ধীরেই সুস্থ সবল অবস্থায় নির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌঁছাই। শ্বাসকষ্টের সমস্যা, শারীরিক বাধা অতিক্রম করে ১০ কিমি দীর্ঘ পথ চলতে গিয়ে জীবনকে নতুন করে উপলব্ধি করি। নিজের শক্তি ও সামর্থ্যকে আবারও আবিষ্কার করি। আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল অনেকখানি। মাত্র ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিটে ১০ কিমি দৌড় কিংবা হাঁটা কোনো চাট্টিখানি কথা নয়। এজন্য শুধু শারীরিক নয়, প্রচণ্ড মানসিক শক্তিরও অধিকারী হতে হয়। আরো জানলাম, জীবন মানেই একটা দৌড়। এই দৌড়ে কখনো হাঁপিয়ে যাব, ক্লান্ত হব, কিন্তু তবু এ দীর্ঘ দৌড় থামানো যাবে না। খুব অল্প গতিতে হলেও ছুটে চলতে হবে। আর এই ছুটে চলার জন্য শারীরিক ও মানসিক ফিটনেস খুবই জরুরি।

তানিয়া কামরুন নাহার লেখক। tanya.kamrun@yahoo.com